তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

মানহীন কারিগরি শিক্ষায় বাড়ছে অদক্ষ কর্মী

অকাজের লেখাপড়া ৩

শরীফুল আলম সুমন ▷

এশিয়ার মধ্যে দ্রুত উন্নতি করেছে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া। এর পেছনে কাজ করেছে তাদের মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা। সিঙ্গাপুরে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ৬৫ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৪০ শতাংশ। আর যুক্তরাজ্য, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে এ শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ১৭ থেকে ৫৮ শতাংশের মধ্যে। এসব দেশের মানুষের বার্ষিক আয় সাত হাজার থেকে ৪২ হাজার মার্কিন ডলারের বেশি। তবে উল্টো চিত্র বাংলাদেশে।

সরকারের দাবি, এ দেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ১৪ শতাংশ। তবে বাস্তবে তা আরো অনেক কম।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, 'বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, সেই হারে কর্মসংস্থান বাড়ছে না। তাই বিদেশের বাজার খুঁজতে হয়। কিন্তু সেখানে অদক্ষ শ্রমিকের কোনো মূল্য নেই। ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাপান, সিঙ্গাপুর,

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

মানহীন কারিগরি শিক্ষায় বাড়ছে অদক্ষ কর্মী

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

মালয়েশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশে আমাদের দেশের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ভালো চাহিদা থাকলেও আমরা দক্ষ জনবল তৈরি করতে পারছি না।' যদিও সরকার ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরিতে ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী আনার ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু মানের দিকে না তাকিয়ে শুধু শিক্ষার্থীর হার বাড়িয়ে কার্যকর ফল পাওয়া যাবে না। মানহীন কারিগরি শিক্ষার কারণেই এখন চাকরির বাজার ধরা সম্ভব হচ্ছে না।'

জানা যায়, দক্ষতা না থাকায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা দেশের শ্রমবাজারেও ঢুকতে পারছে না। বাংলাদেশের পোশাক কারখানা, বায়িং হাউসসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ১২ থেকে ১৫ হাজার বিদেশি কর্মী কাজ করছে। যারা সবাই উচ্চ বেতন পায়। মার্চেন্ডাইজার, প্যাটার্ন মাস্টার ও ডায়িং ইনচার্জ পদেই বেশির ভাগ বিদেশি কাজ করে। বায়িং হাউসে মার্কেটিংয়ের দায়িত্বে যারা আছে, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ভারতীয়। গার্মেন্টে নির্বাহী পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক পর্যায়ে আছেন অনেক ভারতীয় ও শ্রীলঙ্কান কর্মী। আর ডায়িংয়ে ভারতীয়, পাকিস্তানি, শ্রীলঙ্কান ও ফিলিপাইনের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মী রয়েছে। পোশাক ও টেক্সটাইল খাত বাংলাদেশের অন্যতম শিল্প হলেও এসব খাতের জন্য দক্ষ কর্মী তৈরির বিষয়টি তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি কখনোই। শুধু সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে দু-চারটি বিশ্ববিদ্যালয় বিশাল এই খাতে স্বল্পসংখ্যক দক্ষ জনবল তৈরি করছে।

গত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি পরিদর্শনদল দক্ষিণ কোরিয়ার মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শনে যায়। সেই দলের সদস্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামছুল হুদা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একটি মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শনে গেলে সেখানকার একটি ক্লাসের শিক্ষার্থীরা আমাদের জন্য দুপুরের খাবারের আয়োজন করে। যেমন ছিল খাবার, তেমন ছিল পরিবেশনা। খাবারের মান ছিল ফাইভ স্টার হোটেলের সমান। পরে অধ্যক্ষ জানালেন, এটা শিক্ষার্থীদের ট্রেড কোর্সেরই একটি অংশ। জেনারেল এডুকেশনেও মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই একটি ট্রেড কোর্স নিতে হয়। এতে কোনো শিক্ষার্থী যদি মাধ্যমিকের পর আর পড়ালেখা করতে না চায় তাহলে তাকে যে ব্যবহারিক শিক্ষা দিয়ে দেওয়া হয় তাতেই তার পক্ষে ভালো চাকরি পাওয়া সম্ভব। আমরা আগে থিওরিটিক্যাল ক্লাস করে পরে ব্যবহারিক করি। অথচ ওরা আগে ব্যবহারিক করে সেই অনুযায়ী থিওরি পড়ে। ফলে ওদের জন্য সব কিছু খুব সহজ হয়। অথচ আমাদের দেশে এইচএসসি পাস করেও একজন শিক্ষার্থীর দক্ষতা শূন্যই থেকে যায়। জেনারেল এডুকেশনে মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই আমাদের দেশেও একটি ট্রেড কোর্স থাকাটা জরুরি।'

জানা যায়, দেশের ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দীর্ঘদিন ধরে আসনসংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৫২৮টি। কিন্তু কয়েক বছর আগে প্রতিটি পলিটেকনিকেই ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে। এরপর দুই শিফটে ভর্তি করা হয় প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষকসংখ্যা বা অবকাঠামো সুবিধা বাড়েনি। এভাবে চলে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। চলতি শিক্ষাবর্ষে ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ফের আসনসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি দেশের ৬৪টি সরকারি কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে এবং বগুড়া ভোকেশনাল টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটেও চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হয়েছে। কোনো রকমের প্রস্তুতি ছাড়াই এই ৬৫টি প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। ৪৯টি পলিটেকনিকসহ ১১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে ৫৭ হাজার ৩০০ জন। এর মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোতে নির্দিষ্ট বিষয়ই খোলা হয়নি, অথচ তাতেও শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। শিক্ষকের অভাবে ক্লাস নিতে পারছে না প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। ব্যবহারিকের ক্লাস এসব শিক্ষার্থীর কাছে স্বপ্নের মতো। ফলে কোর্স শেষে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা সনদ পেলেও বাস্তবে তারা অদক্ষই থেকে যাচ্ছে।

আর অস্থায়ী শিক্ষক দিয়েই চলছে সরকারি ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। শিক্ষকদের দুই হাজার ১০৭টি শূন্য পদের বিপরীতে ২০১৪ সালে স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রকল্পের (স্টেপ) মাধ্যমে এক হাজার ৪৭ জন এবং স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮৭ জন শিক্ষককে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। এসব শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ ছিল গত বছরের জুন পর্যন্ত। পরে তাঁদের মেয়াদ ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অস্থায়ী ভিত্তিতে এসব শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ায় তাঁদের কাছ থেকে যথাযথ শিক্ষা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা।

দেশের মূল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হিসেবে ধরা হয় ঢাকা পলিটেকনিককে। এ ইনস্টিটিউটে চলতি শিক্ষাবর্ষে তিন হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। অথচ তাদের জন্য ফিজিকস ল্যাব একটি, কেমিস্ট্রি ল্যাবও একটি। যদিও সব শিক্ষার্থীরই এ দুই বিষয় পড়তে হচ্ছে। ফলে একজন শিক্ষার্থীর মাসে একবারের বেশি এসব বিষয়ের ল্যাব ব্যবহারের সুযোগ নেই। ঢাকা পলিটেকনিকে কনস্ট্রাকশন ল্যাব, হাইড্রোলিক ল্যাব ও টেস্টিং ল্যাবও একটি করে। সিভিল, আর্কিটেকচার ও এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্যও একই ল্যাবের প্রয়োজন হয়। এতে এক বিভাগের শিক্ষার্থীরা ল্যাবে গেলে অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা সুযোগ পায় না। আবার যেহেতু ডাবল শিফট তাই শিক্ষকদের পক্ষেও বেশি সময় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ অন্য শিফটের শিক্ষার্থীরা আগেই এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

কারিগরি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ইদ্রিস আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কারিগরিতে শিক্ষার্থী বাড়ানোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও বাড়ানো দরকার। দেশের প্রায় সব পলিটেকনিকেই ল্যাবরেটরির সংকট রয়েছে, শিক্ষক ও ক্লাসরুমের সংকট রয়েছে। এর পরও চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থী বাড়ানো হয়েছে। তাই দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করা দরকার। অস্থায়ী শিক্ষক দিয়ে শিক্ষার মান বাড়ানো সম্ভব নয়। সেদিকেও সরকারকে নজর দিতে হবে।'

বর্তমানে দেশে সব মিলিয়ে সাত হাজার কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলেও এর বেশির ভাগই বেসরকারি। এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই ভুঁইফোড়। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বড় কর্তাদের হাত করে নেওয়া হচ্ছে একের পর এক বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন। অথচ তাদের ক্যাম্পাস, শিক্ষক, লাইব্রেরি বলতে গেলে কিছুই নেই। ভাড়া করা বাড়ির দু-একটি কক্ষে আকর্ষণীয় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে চলছে ব্যবসা। টাকা হলেই ভর্তি হওয়া যায়। যথাসময়ে সার্টিফিকেট পেলেও দক্ষতার দিক দিয়ে শিক্ষার্থীরা অন্তঃসারশূন্যই থেকে যায়।

জানা যায়, সিটি করপোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করলেই পাওয়া যায় অনুমোদন। নীতিমালা আর যোগ্যতার প্রয়োজন নেই, ঘুষ দিলেই এখানে সব হয়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে। এসব প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালাও নেই। বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই গণহারে শিক্ষার্থী ভর্তি করে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এ ছাড়া সরকার বেশ কিছু কারিগরি প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি অধিদপ্তরের অধীন 'স্টেপ' প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে। এমনকি একেকটি প্রতিষ্ঠানকে সাত কোটি টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়া হচ্ছে। অথচ ওই প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তিও দুই-চার কোটি টাকার বেশি মূল্যের হবে না। ভুয়া অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে এ অনুদান। 'স্টেপ' প্রকল্প ও কারিগরি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নের নামে লুটপাট করছে সরকারের টাকা। এতে কাগজে-কলমে কারিগরিতে শিক্ষার্থী বাড়লেও দেশ-বিদেশের চাকরির বাজারে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা টিকতেই পারছে না।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কারিগরি শিক্ষার প্রসার খুবই ভালো দিক। তবে গ্রামগঞ্জে এমনকি শহরেও কারিগরির নামে যেসব প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সেখানে হরিলুট চলছে। শিক্ষকরাও ক্লাস করান না, শিক্ষার্থীরাও আসে না। আর কারিগরি বোর্ড বা অধিদপ্তরেরও তেমন কোনো মনিটরিং নেই। আসলে কারিগরির কারিকুলামই ঠিক নেই। শুধু কারিগরির নামে ফাঁকফোকর দিয়ে ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে। এরা জেনারেলের পড়ালেখাও জানে না, কারিগরিরও না। ফলে তারা চাকরির বাজারেই ঢুকতে পারছে না।'